



মহান আল্লাহর নামে
যিনি পরম করুণাময়, মহান দয়ালু

হুমায়ুন
কবীর

মুসলিমবিশ্ব ও ফিলিস্তিন সংকট

সহসম্পাদনা
বানান ও ভাষারীতি
পৃষ্ঠাসজ্জা
প্রাচ্ছদ

কামরুল হাসান নকীব
মোঃ ইমতিয়াজ উদ্দীন খান, আবদুর রহমান রাফি
ইসমাইল মারুফ
-

মুসলিমবিশ্ব ও ফিলিস্তিন সংকট

মূল

আবুল হাসান আলি নদবি

সম্পাদনা

আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক



সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

মুসলিমবিশ্ব ও ফিলিস্তিন সংকট

আবুল হাসান আলি নদবি

স্বত্ব: সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

প্রচ্ছদ © সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

প্রথম প্রকাশ

শাওয়াল ১৪৪৬ হিজরি, এপ্রিল ২০২৫

ISBN:

MRP:

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ যেকোনো উপায়েই ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা বা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়। বইটির অনুমোদিত অনলাইন সংস্করণ কিনুন। কপিরাইটকৃত বই বেআইনিভাবে কিনে পাইরেসিকে উৎসাহিত করবেন না। ধন্যবাদ।

সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

২য় তলা, ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।

+৮৮ ০১৭৫ ৩৩৪৪ ৮১১

ইসলামে গ্রন্থস্বত্বের বিধান

গ্রন্থস্বত্ব ইসলামি শরিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। ইসলাম প্রত্যেক লেখকের রচিত সকল রচনাকে তার ব্যক্তিগত সম্পদ বলে ঘোষণা করেছে এবং এতৎসংশ্লিষ্ট সার্বিক অধিকারও তার জন্য সংরক্ষণ করেছে। পাশাপাশি কেউ যেন গ্রন্থস্বত্ব-আইন লঙ্ঘন করে তার সে-অধিকার হরণ কিংবা রহিত করতে না পারে, সে-নিশ্চয়তাও বিধান করেছে। ইসলামি শরিয়ার সকল দলিল-প্রমাণ ও মূলনীতি সে-প্রমাণই বহন করছে।

গ্রন্থ-রচনা গ্রন্থকারের নিজেরই বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রমের ফসল ও অর্জন। এ-অর্জন একান্তভাবে তারই। তার অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ কোনোভাবেই তার এ-সম্পদ ব্যবহার করতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

কোনো মুসলিম ব্যক্তির সম্পদ সে নিজে খুশিমনে প্রদান না করলে কারও জন্য কোনোভাবেই তা হালাল হবে না। [সহিহ আল-জামি আস-সাগির, হাদিস: ৭৬৬২]

অতএব, গ্রন্থকারের অনুমতি ছাড়া তার রচিত গ্রন্থ হতে আংশিক বা পূর্ণ কপি করা, ছাপানো এবং তা বেচাকেনা করা ইসলামি শরিয়তে নিষিদ্ধ ও হারাম; কেননা তা অন্যায় উপার্জন ও ভক্ষণের শামিল। আল্লাহ ﷻ বলেন—

...তোমরা পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না। [আল-কুরআন ০২:১৮৮]

অধিকন্তু এটা শরিয়ার সীমালঙ্ঘন বলে গণ্য হবে বিধায় শরিয়তের নিষিদ্ধ কাজেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ ﷻ বলেন—

...তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না; কেননা আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। [আল-কুরআন ০৫: ৮৭]

শিরোনাম

নৈতিক অবক্ষয়: ফিলিস্তিনের ব্যর্থতার মূল কারণ
ফিলিস্তিন বিপর্যয়: শিক্ষা ও করণীয়
আরব বিশ্বের সংকট: প্রকৃত কারণ ও বাস্তবতা
হে আরব নেতৃবৃন্দ, লাভ-ক্ষতির হিসাব করুন!
আত্মসমালোচনা ও নেতৃত্বের জবাবদিহি: উন্মাহর জাগরণের পথ
আল্লাহর দুই বিধান: বিজয়ের চাবিকাঠি
সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী ও চিন্তানায়কদের প্রতি আহ্বান
পরাজয়ের কারণ নিরসন আগ্রাসন প্রতিরোধের চেয়েও জরুরি
ফিলিস্তিন ইস্যু ও ইসলামী চেতনার সংযোগ
আরব ও মুসলিম উন্মাহর পরিণাম

মুখবন্ধ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য; দরদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর
রাসুলের প্রতি।

পৃথিবীতে যেসব মহাদুর্যোগ ও বিপর্যয় দেশ ও জাতিকে নানা সময়ে আক্রান্ত করে, সেগুলো কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, কিংবা নয় নিছক কাকতালীয় বিষয়ও। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ—যারা আল্লাহর সৃষ্টি ও প্রকৃতির বিধান নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেন এবং কুরআনের অলৌকিক ও চিরায়ত বাণীগুলো গভীর মনোযোগে পরখ করেন—তারা তা খুব সহজেই অনুধাবন করতে পারেন যে, এগুলো আসলে দীর্ঘ এক প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত পরিণতি, যা বহুদিন ধরে নানা ঘটনার মাধ্যমে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে—যেসব ঘটনা হয়তো তখনকার সমাজে খুব কম সংখ্যক বিচক্ষণ ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ লক্ষ্য করেনি। এই বিচক্ষণ ব্যক্তিদের আল্লাহ দিয়েছেন সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও সত্যনিষ্ঠ বুদ্ধিমত্তা। আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেছেন—

‘নিশ্চয়ই এতে তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্নদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।’ (সূরা আল-হিজর: ৭৫)

বাস্তবতা হলো, এসব দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের নেপথ্যের মূল অনুঘটক মানুষের কৃতকর্ম, যেগুলোর বেশিরভাগই আত্মিক ও মানসিক। বহুদিন ধরে সেগুলো জাতির জীবন ও সমাজে সক্রিয় থাকে এবং স্বাভাবিক নিয়মেই বহাল থাকে। যারা এসব কৃতকর্মের গতিপ্রকৃতি ও পরিণাম সম্পর্কে জানে, তারা সহজেই অনুমান করতে পারে—এসবের কারণে জাতির ওপর কী নেমে আসতে পারে। তাদের এই অনুমান-ক্ষমতা জ্যোতিষবিদ্যা কিংবা অসাধারণ কোনো প্রতিভার ফলাফল নয়; বরং এটি স্বাভাবিক একটি ব্যাপার। মৌসুমি পরিবর্তনের লক্ষণ দেখে বিজ্ঞজন যেমন বৃষ্টির সম্ভাবনা আঁচ করতে পারেন এবং কখন বৃষ্টি নামবে, তাও আন্দাজ করতে পারেন, আরবের অভিজ্ঞ বেদুইন ও আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানী যেমন প্রাকৃতিক অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান-গবেষণার উপর নির্ভর করে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিতে পারেন, তেমনই একটি ব্যাপার এটি।

হিজরি পঞ্চম শতাব্দীতে ক্রুসেডারদের জেরুজালেম দখল বা সপ্তম শতাব্দীতে মঙ্গোলদের হাতে বাগদাদ ও মুসলিম বিশ্বের পতনও তেমনি আকস্মিক কোনো দুর্ভোগ ছিল না, ছিল না পূর্বাভাসহীন বজ্রপাত অথবা জনপদ উজাড় করে দেওয়া কোনো অপ্রত্যাশিত অগ্নিকান্ড; বরং এটি ছিল দীর্ঘ এক অপরাধ-প্রক্রিয়ার শেষ পরিণতি। এসব প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল মুসলিমদের নৈতিক অবক্ষয়, অবিবেচনা, অন্যায্য আচরণ এবং অসংগত জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে—যে জীবনযাত্রা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল কখনো অনুমোদন করেননি, যে কর্মপ্রক্রিয়া ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও সুস্থ বুদ্ধির পরিপন্থী।

যারা ওই সময়কার ইতিহাস, জীবনীগ্রন্থ, সাহিত্য এবং সমাজব্যবস্থার বিভিন্ন দিক নিয়ে রচিত বইপত্র পড়েছে, তারা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারবে—মঙ্গোলদের বাগদাদ আক্রমণ আসলেই কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিল না; বরং এটি ছিল মহান আল্লাহর নির্ধারিত ফয়সালার প্রতিফলন মাত্র।

আবুল হাসান আল-খাজরাজি বাগদাদে মঙ্গোলদের হামলার পূর্বেই বাগদাদের পরিস্থিতি সম্পর্কে লিখেছিলেন—

‘মুসলিমরা (আজ) কেবলই ভূমি দখল ও সম্পদ উপার্জনে ব্যস্ত। সামগ্রিক কল্যাণের বিষয়ে তারা উদাসীন। গভর্নরেরা জুলুমে লিপ্ত। তাদের একমাত্র মনোযোগ যেন ধন-সম্পদেই নিবদ্ধ। একটা দেশ বা শাসনব্যবস্থা কুফরিতে লিপ্ত থাকলেও তার মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ে না; কিন্তু অবিচারে লিপ্ত হলে তা নিমিষেই ধূলায় মিশে যায়।’^[১]

কুতুবুদ্দীন হানাফি হিন্দি মক্কা মুসলিম বাদশাহ মুসতাসিমের শাসনকালীন বাগদাদবাসীর অবস্থা সম্পর্কে বলেছিলেন—

‘তারা বিলাসিতায় অভ্যস্ত। ফলমূল, শরাব ও বন্ধুমহল নিয়ে তারা বাগদাদ নদীর তীরে প্রশান্তির ছায়ায় অলস দিন যাপন করে। কখনো তারা যুদ্ধে নামেনি, প্রতিরোধ করেনি কোনো আক্রমণ।’^[২]

যারা আরব ইসলামি প্রাচ্যকে (ইয়োরোপীয় ভাষায় ‘মধ্যপ্রাচ্যকে’) গ্রন্থের পাতা থেকে নয়, বরং বাস্তবতার কঠিন মাটিতে দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করেছে; যারা সেখানে সাধারণ মানুষের মাঝে দিন যাপন করেছে, রাজধানীগুলোতে বিচরণ করেছে,

[১] আল-আসজাদুল মাসবুক

[২] আল-ই’লাম বি-ই’লামি বাইতিল্লাহিল হারাম, পৃ. ১৮০, ইয়োরোপীয় মুদ্রণ

সমাজের বিভিন্ন স্তরে মেলামেশা করেছে এবং ১৯৪৮ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত এই ভূখণ্ডের উত্থান-পতনকে গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করেছে—তারা প্রত্যক্ষ করেছে, আরব শাসকদের দ্বিধা ও দুর্বলতার করুণ প্রতিমূর্তি। তারা দেখেছে, কীভাবে তাদের ভঙ্গুর ইচ্ছাশক্তি পরাক্রমশালী ইউরোপীয় শক্তির সামনে তাদেরকে দাসত্ব স্বীকার করতে বাধ্য করেছে।

তারা প্রত্যক্ষ করেছে শাসক, সেনাপতি ও ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা নেতৃবৃন্দের চরিত্র—তাদের আত্মতুষ্টি, ভোগবিলাস, স্বার্থপরতা এবং দায়িত্বের বোঝা এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা।

তারা দেখেছে—বিশেষত তৎকালীন আরববিশ্বের বুদ্ধিবৃত্তিক, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক ও ধর্মীয় আন্দোলনের সূতিকাগার মিসরের বৃকে—কেমন করে সাহিত্যিক, লেখক ও দায়িরা ধর্মের মৌলিকত্ব, নৈতিকতা, সামাজিক শৃঙ্খলা ও ঐতিহাসিক সত্যকে ছিন্নভিন্ন করেছে। কীভাবে তারা কলমের শক্তিকে ব্যবহার করেছে সৎ জীবন ও উত্তম চরিত্রের ভিত্তি ধ্বংস করতে এবং এমন চিন্তানৈতিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে, যেখানে নেই সত্য-মিথ্যার ব্যবধান, নেই ন্যায়-অন্যায়ের কোনো সীমানা; যেখানে শেকড় গেড়েছে ভোগবাদ, আঞ্চলিক সংকীর্ণতা ও ফিরাউনি দাস্তিকতা; যেখানে জোয়ার চলছে পাশ্চাত্য-মোহ ও ধর্মহীনতার। তারা দেখেছে, কীভাবে তাদের হাত ধরে নিয়মিত সৃষ্টি হচ্ছে এমন সব সাহিত্য, কুরআন যাকে অভিহিত করেছে ‘কপট মস্তের মোহজাল’^[১] বলে। তারা দেখেছে, কীভাবে তারা পরিকল্পিতভাবে মানুষের মন-মস্তিষ্কে সন্দেহ, হতাশা, নৈতিক বিচ্যুতি, বিকৃত রুচি, কাপুরুষতা, সংকল্পহীনতা ও সস্তা বিনোদনের প্রতি আসক্তি রোপণ করেই যাচ্ছে এমন নাযুক মুহূর্তে, যখন জাতির সামনে জমছে দুর্যোগের কালো মেঘ।

তারা দেখেছে, কীভাবে ধর্মীয় নেতা ও আলেমগণ সত্য উচ্চারণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, অন্যায়ের বিরোধিতা ও ন্যায়ের সাক্ষ্যদান থেকে পিছপা হয়ে গেছে। কীভাবে তারা মিথ্যা আদর্শের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে—যা ধন-সম্পদ, পার্শ্ব স্বাচ্ছন্দ্য, পারিবারিক স্বার্থের মোহ ছাড়া কিছুই নয়। তারা দেখেছে—কীভাবে লোভ তাদেরকে বৈধ-অবৈধ পথের পার্থক্য ভুলিয়ে দিয়েছে।

তারা দেখেছে, কীভাবে সাধারণ জনগণ ও শ্রমজীবী শ্রেণি গান-বাজনা ও

[১] আল-আনআম: ১১২

বিনোদনে নিমগ্ন হয়ে পড়েছে।

তারা লক্ষ করেছে, সমাজের স্তরগত পার্থক্য সত্ত্বেও কীভাবে তারা সকলেই জীবনের প্রতি গভীর আসক্ত এবং মৃত্যুর প্রতি প্রচণ্ড নিষ্পৃহ; কীভাবে তাদের ভীতু হৃদয় জগতের সকল প্রকার ঝুঁকি ও আত্মত্যাগ থেকে পালিয়ে বেড়ায়।

যারা এসব কিছু প্রত্যক্ষ করেছে, গভীরভাবে অনুধাবন করেছে এবং বাস্তবতার তীর তিক্ততায় তা উপলব্ধি করেছে, তারা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছে— মুসলিমরা আজ সামান্যতম বহিঃশক্তির আঘাতও সহ্য করার পরিস্থিতিতে নেই। তারা নিজেদের ধর্ম, সম্মান, পবিত্র স্থান ও অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ের সক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছে।

এ বাস্তবতাগুলো তখন গুটিকয়েক লেখকের কলমে প্রবাহিত হয়—যাদেরকে আল্লাহ দান করেছিলেন কুরআনের গভীর অন্তর্দৃষ্টি, ইতিহাসের শিক্ষা ও জাতির উত্থান-পতনের চিরন্তন বিধান বোঝার তীক্ষ্ণ বোধ। অনেক খতিবও এই সত্যকে উচ্চারণ করেন—যাদেরকে আল্লাহ এমন নাজুক সময়ে মুখ খোলার তাওফিক দান করেছিলেন।

তারা সময়ের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, নিজেদের জাতিকে আসন্ন ধ্বংসের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন।

তাদের এই সতর্কবাণী কোনো অলৌকিক ভবিষ্যদ্বাণী ছিল না, গায়েবি জ্ঞান ছিল না, ছিল না অনন্য প্রতিভার প্রকাশও।

১৯৬৭ সালের ৫ই জুনের বিপর্যয় ছিল সেই গভীর অবক্ষয়ের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ, যার কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এ বিপর্যয় যেন মুহূর্তেই সকলের চেতনা উন্মোচিত করে দেয়, প্রতিটি দৃষ্টির সামনে থাকা মোহের আবরণ সরিয়ে নেয়, আরব ও মুসলিম বিশ্বকে নাড়া দেয় প্রবলভাবে। জাতি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়ে, আত্মপোলক্লির তাড়নায় উন্মুখ হয়ে খুঁজতে থাকে—এই ভয়াবহ পরিণতির প্রকৃত কারণ কী? কী সেই দায় ও অপরাধ, যা তাদেরকে এমন করুণ পরিণতির দিকে ঠেলে দিল? এ নিয়ে নানা বিশ্লেষণ, মতপার্থক্য, তত্ত্ব ও চিন্তাসূত্র গড়ে ওঠে। একেকজন একেক পথ ধরেন, একেকজন একেক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেন। এবং এত এত আলোচনা, এত গবেষণা এবং এত গ্রন্থ-প্রবন্ধ লেখা হয় যে, এসবকে নতুন জ্ঞানভাণ্ডার বললেও অত্যুক্তি হবে না।

কিন্তু জাতির অবক্ষয়ের কারণ তালাশের এই আগুন আজকের নয়। এই বইয়ের লেখক বহু আগেই এই সংকটের মূলে পৌঁছানোর চেষ্টা করেন, বহু বছর আগে

তিনি এই দুর্যোগের ছায়া দেখতে পান। তখনই তাঁর লেখনি ও বক্তব্য থেকে এমন কিছু সত্য উন্মোচিত হয়, যা পরবর্তীকালে বাস্তবে রূপ নেয়। কারণ এই বিপর্যয় আকস্মিক কোনো দুর্ঘটনা ছিল না, ছিল না কোনো অস্পষ্ট খাঁধাও; কুরআনের গভীর অন্তর্দৃষ্টি, বাস্তবতার নির্মোহ বিশ্লেষণ, এবং এ অঞ্চলের রাজনৈতিক ও সামাজিক গতিপ্রকৃতি বোঝার সামর্থ্য থাকলে এ পরিণতি সকলের কাছেই অনিবার্য বলে প্রতীয়মান হতো।

অতঃপর যখন দুর্যোগ নেমে আসে, তখন লেখক একে নিজের ভাবনা, অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের কেন্দ্রে নিয়ে আসেন। তিনি কলম চালিয়ে যান, বক্তৃতা প্রদান করেন, মানুষের সামনে এই সংকটের মূল কারণ তুলে ধরেন। তাঁর এসব রচনা ও ভাষণ ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়, বহু মানুষের হাতে হাতে পৌঁছে যায়। তার কথায় থাকে—কুরআনের আলো, প্রকৃতির বিধান, ইতিহাসের তিক্ত শিক্ষা, এবং উম্মাহর অবস্থার নির্ভুল বিশ্লেষণ; কোনো অতিরঞ্জন নয়, কৃত্রিমতা নয়, নয় অন্ধ আশাবাদ বা নিরাশার বাড়াবাড়ি। তিনি মানুষের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেন রোগের প্রকৃত কারণ, জাতির দুর্বলতার মূল শিকড় এবং নিরাময়ের পথ।

এই প্রবন্ধ ও বক্তৃতাগুলো বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন পরিবেশে প্রদান করা হলেও মূলত এগুলো অভিন্ন এক সূত্রে গাঁথা—প্রকৃত সত্যের অনুসন্ধান এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে জাতির সামনে তার প্রকাশ; কোনো রাখঢাক নয়, কোনো কৌশলী আপস নয়, কোনো চাটুকারিতা নয়—কেবলই নির্মম বাস্তবতার স্বরূপ উন্মোচন।

এই প্রবন্ধ ও বক্তৃতাগুলো এক মলাটে গ্রন্থাকারে ‘মুসলিমবিশ্ব ও ফিলিস্তিন সংকট’ শিরোনামে প্রকাশ করা হয়েছে। গ্রন্থটি পাঠকের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে এই আশায় যে, এটি তার চিন্তার পথ উন্মুক্ত করবে, ভাবনার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে, এবং নতুন পথচলার দিশা দেবে।

‘আর আপনি স্মরণ করিয়ে দিন, কেননা এটি ঈমানদারদের জন্য উপকারী।’^[১]

এখানে একটি বিষয়ে সম্মানিত পাঠকের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি—পাঠক হয়তো লক্ষ করে থাকবেন, কিছু বক্তব্য ও বিশ্লেষণ একাধিক স্থানে পুনরাবৃত্ত হয়েছে। এর কারণ হলো, এসব বক্তৃতা ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে প্রদত্ত। স্থান ও সময়ের দাবি অনুযায়ী কোনো কোনো ভাবনা বারবার তুলে ধরা হয়েছে। তবে প্রিয় পাঠক, এটিই

[১] আয-যারিয়াত: ৫৫

কুরআনের অনুসরণ ও দাওয়াতের প্রচলিত নীতির অনুসৃতি, যা যুগ যুগ ধরে নবী,
দাঈ ও সমাজসংস্কারকগণ অবলম্বন করে আসছেন।

‘আর আল্লাহই সত্য বলেন, এবং তিনিই সঠিক পথের দিশা দেন।’^[১]

- আবুল হাসান আলি নদবি

[১] আল-আহযাব: ৪

নৈতিক অবক্ষয়: ফিলিস্তিনের ব্যর্থতার মূল কারণ

মুসলিমদের অধঃপতন শুরু হয়েছে, বহু কাল হলো। দিনদিন এ সঙ্কট আরও যেন প্রকটতর হচ্ছে। দিন যত যাচ্ছিল নৈতিক অবক্ষয় ও অবনতি বেড়েই চলেছিল। মুসলিম সমাজের রক্তে রক্তে পচন ধরেছিল। হিজরি চতুর্দশ শতাব্দীর শুরুতে^[১] পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে, মুসলিম জাতি একটি অন্তঃসারশূন্য ও বিকলাঙ্গ জাতিতে পরিণত হয়, যাদের মাঝে না আছে প্রাণস্পন্দন আর না আছে রক্তের উষ্ণতা। যেন তারা (মুসলিম জাতি) পঁচা কাঠের এক বিশাল দালান, যেখানে মানুষ এখনও আশ্রয় নেয়। দূর থেকে ভবনটিকে দেখতে লাগে ভয়ঙ্কর। অথবা এ যেন (মুসলিম উম্মাহ) এমন একটি প্রকাণ্ড গাছ, যার শিকড় গিলে ফেলা হয়েছে, যার বিশাল কাণ্ড পঁচে গেছে, কিন্তু এখনও উপড়ে ফেলা হয়নি। এই যখন পরিস্থিতি, তখন তাদের ভূমিগুলো লুটের মালে পরিণত হয়ে পড়ে, যা লুণ্ঠনকারীদের হাত থেকে রক্ষা করার মতো কেউ ছিলো না। আর তাদের রাজ্যগুলো দখলদারদের খাবার শিকার এবং তা পরিণত হয়েছে ভক্ষকদের উপাদেয় খাদ্যে।

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত বাণী তাদের ক্ষেত্রে সত্য প্রমাণিত হয়েছে—

অদূর ভবিষ্যতে তোমাদের বিরুদ্ধে (ইসলাম বিদ্বেষী) বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী একে অন্যকে এমনভাবে আহ্বান করবে, যেমন ক্ষুধার্ত ব্যক্তিরা একে অন্যকে খাবারের বর্তনের প্রতি ডেকে থাকে। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, তখন কি আমরা সংখ্যায অনেক কম হব? তিনি বললেন, না—বরং সে সময় তোমরা সংখ্যায অনেক বেশি হবে; কিন্তু তোমাদের অবস্থা হবে সমুদ্রের ফেনার মতো। আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের অন্তর হতে তোমাদের সমীহ-ভীতি দূর করে দেবেন আর তোমাদের হৃদয়ে ওয়াহান ঢেলে দেবেন। জনৈক সাহাবি জানতে চাইলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ!

[১] এই শতাব্দী শুরু হয় ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে

ওয়াহান কী? তিনি বললেন, দুনিয়ার মহব্বত ও মুতু্যর প্রতি ঘৃণা।^[১]

দিনকে দিন মুসলিমদের সামগ্রিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটল; অবশেষে খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতকে তাদের ওপর হামলে পড়ে ইউরোপীয় খ্রিস্টান ক্রুসেডাররা। সভ্যতার মুখোশখারী বর্বর স্বল্পবসনা জাহেল সম্প্রদায়ের^[২] আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে মুসলিমরা তাদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেয় এবং নিজেদের স্বার্থ রক্ষার তাগিদে বিশ্বনেতৃত্বের আসন থেকে ছিটকে পড়ে।

মুসলিমদের নৈতিক অবক্ষয় এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তাদের মধ্যে এমন একটি শ্রেণি গড়ে ওঠে, যারা জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, সামান্য কিছু অর্থের লোভ সামলাতে না পেরে মুসলিমদের ভূমি শত্রুদের হাতে তুলে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, এরা স্বেচ্ছায় শত্রুদের সেনাবাহিনীতে গিয়ে যোগদান করেছে। শত্রুদের পক্ষ নিয়ে নিজেদের ভূমিতে হামলা করেছে।

পশ্চিমাদের এই আক্রমণ ছিল প্রাচ্যের মঙ্গোল ও তাতারীদের আক্রমণের চেয়েও বহুগুন ভয়াবহ। এর প্রভাব ছিল অত্যন্ত গভীর এবং সুদূরপ্রসারী। এই আক্রমণের ফলে হৃদয়ের নিভৃত কোণের সেই আশার প্রদীপ প্রায় নিভেই গিয়েছিল, যা শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী কোনো ঝড়ই নেভাতে পারেনি। তারপর থেকে উম্মাহর আশার প্রদীপ ছাইভস্মের নিচে চাপা পড়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো কখনও জ্বলে ওঠে। আবার একা একাই নিভে যায়।

শত্রু পক্ষের বুদ্ধিজীবীরা মুসলিমদের হৃদয়ের মাঝে সুপ্ত আত্মিক শক্তির উৎস অনুসন্ধান করতে গিয়ে বুঝতে পেরেছে যে, মুসলিমদের আত্মিক দৃঢ়তা ও জীবনীশক্তির সবচেয়ে বড় উৎস হলো ঈমান। ঈমানের বদৌলতে ইতোপূর্বে কী ঘটেছিল, তারা তা প্রত্যক্ষ করেছে অতীত ইতিহাসের দর্পনে। মুসলিমরা ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান হয়ে বহু অলৌকিক ঘটনা ও অতিপ্রাকৃত বিষয়ের অবতারণা করে দেখিয়ে দিয়েছিল, ঈমান কী না করতে পারে। তাই শত্রুরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে এমন দুটি শত্রুকে লেলিয়ে দেয়, যারা উম্মাহর জন্য মঙ্গোল, তাতার কিংবা মারাত্মক মহামারীর চেয়েও বেশি ক্ষতিকারক হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

[১] সুনানে আবু দাউদ: ৪২৯৭

[২] যারা এই জাতির চরিত্র ও ইতিহাস সম্পর্কে জানেন, এসব গুণের ব্যাপারে তারা নিশ্চয়ই দ্বিমত পোষণ করবেন না

তন্মধ্যে প্রথম শত্রু হলো, সংশয়বাদ ও ঈমানের দুর্বলতা। ভীৰুতা ও কাপুরুষতা সৃষ্টির জন্য এর চেয়ে কার্যকর কিছু নেই।

আর দ্বিতীয় শত্রু হলো, হীনম্মন্যতা।^[১] এর ফলে মুসলিমরা ভেতরে ভেতরে নিজেদেরকে হীন ও নীচ মনে করতে থাকে। মনে মনে লাজ্জিত অনুভব করতে থাকে। নিজেদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও নৈতিকতা সম্বলিত যে কোনো কিছুকেই তুচ্ছ জ্ঞান করতে শুরু করে। নিজেরাই নিজেদের কাছে লজ্জিত হতে থাকে। সকল বিষয়ে ইউরোপীয়দেরকে শ্রেষ্ঠ মনে করে। ভাবে, সর্বোত্তম গুণাবলী তাদের মাঝেই আছে। জীবনের কোনো ক্ষেত্রে ইউরোপীয়দের ত্রুটি-বিচ্যুতি স্বীকার করতেই চায় না। কোনো সময় তাদের পরাজয় ও ব্যর্থতার কথা বিশ্বাস করে না।

এমন হীনম্মন্যতা যখন কোনো জাতির ওপর চেপে বসে, তখন তাদের অপমৃত্যু ঘটে, যদিও দেখা যায়, তারা দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে, খাওয়া-দাওয়া থেকে নিয়ে জীবনের সকল পরিসরে তাদের সরব উপস্থিতি বিদ্যমান।

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও পাশ্চাত্য দর্শনের প্রভাবে, মুসলিমরা নানামুখী ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, বস্তুবাদের পূজা, দুনিয়ার প্রতি মোহ, রাতারাতি পার্থিব সম্পদ অর্জনের লালসায় ছুটতে থাকা, ইউরোপীয় মূর্খ জাতিগুলোর মতো নীতিনৈতিকতার চেয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও বস্তুগত সুবিধাকে প্রাধান্য দেওয়া। এই নৈতিক অধঃপতনের ফলে তাদের মাঝ থেকে হারিয়ে গেছে এলায়ে কালিমা তুল্লাহ-এর উদ্দেশ্যে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের স্পৃহা, আকিদা বিশ্বাস রক্ষার পথে কষ্ট সহ্য করার মানসিকতা, সিরাতে মুস্তাকিমের পথে অবিচল থাকতে গিয়ে শত বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করার জজবা।

এসবের ফলস্বরূপ মুসলিমদের মাঝে এমন একটি প্রজন্মের আবির্ভাব ঘটেছে, যারা বুদ্ধিতে পাকা, কিন্তু আত্মিক আধারে নিমজ্জিত, ভেতরটা অন্তঃসারশূন্য, ভঙ্গুর ঈমান, না আছে ধার্মিকতা, না আছে ধৈর্য ও কষ্ট সহিষ্ণুতা। না আছে দৃঢ়তা, আর না চারিত্রিক শুদ্ধতা। ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার বিনিময়ে তারা দীনকে বিক্রিয়ে দেয়। দুনিয়ার লোভে তারা দীনকে ছুঁড়ে ফেলে। ব্যক্তিগত লাভ, যশখ্যাতি ও মিথ্যা মর্যাদা লাভের জন্য তারা দেশ ও জাতিকে বিক্রি করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। নিজের ও নিজের জাতির প্রতি তাদের কোনো আস্থা নেই। পরনির্ভরশীলতাই তাদের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তাআলা সত্য বলেছেন—

[১] ইংরেজিতে যাকে বলা হয় Inferiority Complex

তুমি যখন তাদেরকে দেখ, তখন তাদের দেহাকৃতি তোমার কাছে বড় ভালো লাগে আর তারা যখন কথা বলে তুমি তাদের কথা শুনতে থাকো, তারা যেন (কোন কিছুতে) ঠেকনা দেওয়া কাঠ। তারা যে-কোন হাঁক-ডাককে নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে।^[১]

এরাই এসব লোক, যারা মুসলিমদের মাঝে ভীষণতা কাপুরুষতা ও মৃত্যুভীতি ছড়ায়। তারা মুসলিমদেরকে আল্লাহ নির্ভরতার পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে। মুসলিমদেরকে তারা আত্মনির্ভরশীল হতে দেয় না। পরনির্ভরশীল বানিয়ে রাখে। অন্যদের কাছে হাত পাতা ও বিপদে অন্যদের আশ্রয় গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করে।

এরাই মুসলিমদের অন্তরে সুপ্ত দ্বীনী গায়রত ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের স্ফুলিঙ্গকে নিভিয়ে দেয়। দ্বীনী গায়রত ও জিহাদের স্পৃহাই জ্ঞানের নতুন দ্বার উন্মোচন করেছিল এবং আকলকে নতুন পথের দিশা দিয়েছিল। ফলে জ্ঞান ও আকল এমন কিছু করতে সক্ষম হয়েছিল, যা ইতিপূর্বে হাজার বছরেও করতে পারেনি। এসব বুদ্ধিজীবীরা তার পরিবর্তে হাজির করল ঘুমন্ত অসুস্থ জাতীয়তাবাদের দর্শন। জিহাদের জ্ঞানমুখী উদ্দীপনার পরিবর্তে তারা হাজির করল ঐটিযুক্ত অসুস্থ আকল, যেই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বাঁধা আর প্রতিবন্ধকতা ছাড়া কিছুই দেখা যায় না।

আকীদা-বিশ্বাস ও মনস্তাত্ত্বিক এই বিরাট পরিবর্তন এবং রূহানী ও ঈমানী শক্তির এই দৈন্যদশা ফিলিস্তিন যুদ্ধে সবচেয়ে কদর্যভাবে প্রকাশ পেয়েছে। চতুর্দশ শতাব্দীর ফিলিস্তিন যুদ্ধ আরব বিশ্বের জন্য একটি কলঙ্ক হয়ে থাকবে। যেমন সপ্তম শতাব্দীতে তাতারদের অগ্রযাত্রার সামনে মুসলিমদের পরাজয় ও শোচনীয় ব্যর্থতা ইসলামি বিশ্বের জন্য একটি কলঙ্কজনক অধ্যায় হিসেবে আজও চিহ্নিত হয়ে আছে।

[১] সূরা মুনাফিকুন: ৪